

এক এবং অদ্বিতীয়া ইন্দিরা

জহর সরকার

আজ আমরা ইন্দিরা গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছি। ভারতের ইতিহাসে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম শক্তিশালী শাসক ছিলেন — যদিও নানা বিতর্কও তাঁকে ঘিরে ছিল।

২৪ জানুয়ারি, ১৯৬৬ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতারা ধারণা করেছিলেন, তিনি যেহেতু রোগা-পাতলা এবং অভিজ্ঞতাহীন, তাই তারা তাঁকে ‘শোভাময়ী’ প্রধানমন্ত্রী করে রেখে নিজেরাই ক্ষমতা চালাবেন।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই তিনি নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন এবং প্রবীণ, মধ্যম ও প্রতিভাবান নবীন মন্ত্রীদের নিয়ে নিজের একটি ছোট দল গঠন করেন—যেমন প্রণব মুখার্জি। এরা কংগ্রেসের পুরনো গোষ্ঠীর রক্ষণশীল নীতি থেকে এতটাই সরে আসতে শুরু করলেন যে ১৯৬৯ সালে তাঁকেই—দেশের প্রধানমন্ত্রীকে—কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করা হলো।

এত বড় সঙ্কটে তিনি নির্ভীক ছিলেন এবং নিজের অনুগামীদের নিয়ে নতুন কংগ্রেস গঠন করেন, যা পুরনো এবং অর্থবলে শক্তিশালী কংগ্রেস নেতাদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। পুরনো দলটি ‘কংগ্রেস (ও)’— অর্থাৎ ‘অরগানাইজেশন’—নামে দলীয় দপ্তর, সম্পদ ও সমর্থকদের দখলে রাখে।

এরপর ইন্দিরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে থাকা অর্থবলীদের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানলেন এবং ১৯৬৯ সালের ১৯ জুলাই ভারতের ১৪টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেন। এটি ছিল এক ঐতিহাসিক ও সাহসী সিদ্ধান্ত, এবং পরে তিনি আরও বেসরকারি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল—জনগণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবহার করা। এর ফলে কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প এবং গ্রামীণ জনগণ সহজে ব্যাঙ্ক পরিষেবা ও ঋণ সুবিধা পেতে থাকে। ভারতীয় অর্থনীতিকে সমাজতান্ত্রিক পথে নিয়ে যাওয়ার এটাই ছিল তাঁর প্রথম বড় পদক্ষেপ।

১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে তিনি সারা ভারত ভ্রমণ করে পরিবর্তন ও সাধারণ মানুষের উন্নতির বার্তা ছড়িয়ে দেন। তিনি বিখ্যাত স্লোগান দেন—“গরিবি হটাও, দেশ বাচাও।” তাঁর নারীত্বের দৃঢ়তা ও শক্তির ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে। তাঁর নতুন কংগ্রেস দল রক্ষণশীল দলগুলোর জোটকে পরাজিত করে বিপুল জয় লাভ করে।

১৯৭১ সালে তিনি ভারতের সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী আনেন, যার ফলে সংবিধানের ২৯১ ও ৩৬২ অনুচ্ছেদ বাতিল হয় এবং প্রাক্তন রাজা-নবাবদের দেওয়া ‘প্রিভি পার্স’—অর্থভাতা—সমাপ্ত হয়। এটি সমাজে ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠার পথে এক বড় পদক্ষেপ ছিল।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা শুরু করে। এর ফলে প্রায় এক কোটি বাঙালি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতীয়রা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যালীলায় ক্ষুব্ধ ছিল। আন্তর্জাতিক সমর্থন পেতে ইন্দিরা বিদেশ সফর করেন এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ঐতিহাসিক ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে নিম্ন-কিসিঞ্জার প্রশাসনের পাকিস্তানপন্থী অবস্থানের মোকাবিলা করা যায়।

এরপর তিনি সংসদে শক্তিশালী অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতি সরাসরি ও পরোক্ষ সাহায্য শুরু করেন। ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে, ইন্দিরা প্রস্তুত ছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিলে দেশটিকে মুক্ত করে এবং ‘বাংলাদেশ’ নামে নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম হয়।

এটি নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলোর অন্যতম!

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ইন্দিরার জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী হয়। ১৯৭২ সালের মার্চে তাঁর দল বহু রাজ্যে বিজয়ী হয়। কিন্তু তারপরই নানা রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে গুজরাট ও পরে বিহারে জেপি নারায়ণের নেতৃত্বে ‘সম্পূর্ণ বিপ্লব’ আন্দোলন শুরু করে।

প্রতিআক্রমণে ইন্দিরা ২৫ জুন ১৯৭৫ ‘অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা’র অজুহাতে দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। তিনি বিরোধী নেতাদের কারাবন্দি করেন, সংবাদমাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন, নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করেন এবং এক সর্বাধিনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেন—যা আজও তাঁর বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়। বিরোধী শক্তিকে পরাস্ত হয়েছে বলে মনে করলে তিনি ২১ মার্চ ১৯৭৭ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করেন এবং নির্বাচন ঘোষণা করেন।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল জনরোষের ফলে তিনি পরাজিত হন। বিজয়ী বিরোধীরা একত্রিত হয়ে মোরারজি দেসাইয়ের নেতৃত্বে জনতা সরকার গঠন করে। ১৯৭৮ সালে ইন্দিরা ও তাঁর সমর্থকেরা কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে কংগ্রেস (আই)—অর্থাৎ ‘ইন্দিরা কংগ্রেস’—গঠন করেন। জনতা সরকার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে, তবে তারা ইন্দিরাকে দুর্নীতির অভিযোগে কারাবন্দি করেছিল (অক্টোবর ১৯৭৭–ডিসেম্বর ১৯৭৮)।

জেল থেকে মুক্তির পর নভেম্বর ১৯৭৮-এ তিনি আবার লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালের জানুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস (আই) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফেরে।

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে তাঁর পিতার সমাজতান্ত্রিক শিল্পনীতি অনুসরণ করেন। তিনি ১৯৭৫ সালে ‘বিশ-দফা কর্মসূচি’ আনেন—যা দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রথম পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা। তিনি ‘সবুজ বিপ্লব’-এর ওপরও বিশেষ জোর দেন, যা ভারতের কৃষিক্ষেত্রে আমূল বদলে দেয়। পরে তিনি কয়লা শিল্পও জাতীয়করণ করেন।

১৯৮০-এর দশকের শুরুতে তিনি ভারতের জাতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে বিপদ অনুভব করেন। ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে পাঞ্জাবে খালিস্তান আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। কেউ কেউ অভিযোগ

করেন, প্রথমদিকে ইন্দিরাই ভিন্দ্রানওয়ালেকে ব্যবহার করেছিলেন অকালি দলের প্রভাব কমাতে। কিন্তু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তিনি সেনাবাহিনীকে স্বর্ণমন্দিরে পাঠান—‘অপারেশন ব্লু স্টার’—খালিস্তান আন্দোলন দমন করতে। এতে শিখদের প্রবল ক্ষোভ তৈরি হয় এবং তাঁরই বিশ্বস্ত শিখ দেহরক্ষীরা ৩১ অক্টোবর ১৯৮৪ তাঁর নিজ বাসভবনে তাঁকে হত্যা করে।

ইতিহাসই বিচার করবে—তাঁর মহান কীর্তি এবং তাঁর ভুলত্রুটি।

[Translation of the article posted in Enewsroom , 19.11.2025, by Anindita Bhattacharya]

Link to the original article: <https://enewsroom.in/prime-minister-indira-gandhi-bangladesh-emergency-bank-nationalisation/>